মোকাম্মেল হোসেন

মন খারাপের বিষয়-বৃত্তান্ত

রম্য গল্প

বাস ছাড়ার আগে পাঁচজনকে টার্গেট করেছিলেন হায়াতুজ্জামান। বেনাপোল সীমান্তে পৌঁছার পর দেখা গেল, চারজনের সামনে ডাব হাতে দাঁড়িয়ে চার যুবক সংলাপ আওড়াচ্ছে—

: ইয়ে ডাবমে, ইয়ে বহুত আচ্ছি ঠান্ডি পানি হ্যায়!

যুবক চতুষ্টয়ের উদ্দেশে অনুচ্চকণ্ঠে একটা গালি উৎসর্গ করলেন হায়াতুজ্জামান। আর তখনই পেছন থেকে কিন্নর কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

: কিছু বললেন?

হায়াতুজ্জামান ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন, তার টার্গেট করা পাঁচজনের শেষজন। হায়াতুজ্জামান মনে মনে আল্লাহর দরবারে শোকরগুজার করে বললেন—

: বলতে ছিলাম এদের সিস্টেম সম্পর্কে। পাসপোর্টে ভিসা লাগানোই আছে। দেখব আর পটাপট ছাড়ব; তা না কইরা চৌদ্দগোষ্ঠীর ইতিহাস লেখা শুরু হইছে!

হায়াতুজ্জামানের কথা শুনে কিন্নরকণ্ঠী নিঃশব্দ হাসি উপহার দিল। হায়াতুজ্জামান প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন—

: আপনার নামটা জানা হয় নাই।

: আমার নাম তারাবানু।

: কোন সংস্থা?

: খাইদাই-ঘুমাই সংস্থা।

: বুঝলাম না।

: সংস্থা করে আমার স্বামী। এই ট্যুরে তারই আসার কথা ছিল। হঠাৎ খবর এলো, গ্রামের বাড়িতে তার মা অসুস্থ...

: তার মা মানে আপনার শাশুড়ি। শাশুড়িকে দেখতে আপনি গেলেন না?

: নাহ।

: তার প্রতি কিন্তু আপনারও একটা কর্তব্য আছে!

: অবশ্যই আছে; আর আমি তা স্বীকারও করি। কিন্তু ভাবলাম, যাদের চেহারা দেখতে দেখতে রাতে ঘুমাই, আবার সকালে উঠেই যাদের চেহারা দেখি; তাদের লীলাভূমি বোম্বাই যাওয়ার সুযোগটা নষ্ট করা উচিত না। তাই হাজবেন্ডরে বললাম— দেখ মনসুরের আব্বা! আল্লাহপাক মানুষরে অসুখ-বিসুখ দেন; আবার তিনি তা ভালোও করেন। তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও; আর আমি তোমার সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করার নামে বোম্বাই থেইকা একটা চক্কর দিয়া আসি।

তারাবানু মুম্বাইকে বোম্বাই উচ্চারণ করছে শুনেও ভুল শুধরে দিলেন না হায়াতুজ্জামান। নারীজাতির ভুল ধরলেই বিপদ। হায়াতুজ্জামানের মতে, নারীজাতিরে সৃষ্টি করে ভুল যা করার তা আল্লাহ রাব্বুলই করে ফেলেছেন; এরপর আর নারীজাতির নামের পাশে ভুল শব্দটি সংযোজন করা উচিত নয়। তারা যা করবে, সব ঠিক। তারা যা বলবে, বিলকুল সঠিক। অতএব তারাবানু যা বলছে এবং ভবিষ্যতে যা বলবে— সবকিছু সঠিক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

পেট্রাপোল সীমান্ত অতিক্রম করার পর হায়াতুজ্জামান দেখলেন, একটা ছেলে ভ্যানে করে ডাব বিক্রি করছে। তিনি যুবক চতুষ্টয়কে দেখানোর জন্য দুটো ডাব কিনে একটা তারাবানুর সামনে ধরে বললেন—

: ইয়ে হিন্দুস্তানি ডাব্বি হ্যায়...

এটুকু বলেই হায়াতুজ্জামানের মনে হল— ডাবের হিন্দি ডাব্বি কিনা, তা তিনি জানেন না। এই মহিলার কথায় বোঝা গেছে, সে হিন্দি চ্যানেল দেখতে দেখতে ঘুমায়; ঘুম থেকে জেগে ওঠে হিন্দি চ্যানেল দেখা শুরু করে। হিন্দি চ্যানেল যার রাত-দিনের সঙ্গী; ধরে নেয়া যায়, সে হিন্দি ভালোই বোঝে। এর কাছে এলেম জাহির করতে গেলে চিচিংফাঁক হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। চিচিংফাঁক হতে দেয়া যাবে না। এলেম না থাকলেও এলেমদারের ভাব নিতে হবে। নারীজাতি ভাব পছন্দ করে। প্রবলভাবে পছন্দ করে। হায়াতুজ্জামান হিন্দি ছেড়ে ইংরেজি ধরলেন। বললেন—

: ফ্রেশ ওয়াটার; ভেরি হাইজেনিক অ্যান্ড ন্যাচারাল...

২

বাস যাত্রায় তারাবানুর সঙ্গে পাশাপাশি সিটে বসে কলকাতা পর্যন্ত এলেন হায়াতুজ্জামান। আসার সময় সুযোগ খুঁজেছেন আপনি থেকে তুমিতে নামার। সেরকম আবেগঘন কোনো পরিবেশ তৈরি হয়নি। তবে তারাবানুর হাবভাব দেখে মনে হয়েছে, বরফ গলতে শুরু করেছে। এটাই চাচ্ছেন হায়াতুজ্জামান; তাকে ঘিরে এই মহিলার মধ্যে একটা নির্ভরশীলতা তৈরি হোক। ঠেকায় পড়লে মানুষ ঘাটের মাঝিকে বাপ বলে সম্বোধন করে। আর দেশ ছেড়ে একা বিদেশে এসে তারাবানু তাকে হাতু ভাই ডাকবে না, এটা তো হতে পারে না।

কলকাতায় ঘণ্টা ছয়েকের বিরতি। বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের সম্মেলনে যোগ দিতে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার ছিয়াশি জনের একটি দল যাচ্ছে মুম্বাই। এদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত ফর্টি-সিক্সটি। গণনার কাজটা হায়াতুজ্জামান ঢাকা থেকে বাস ছাড়ার প্রাক্কালেই

সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য, পথের সঙ্গী নির্বাচন করা। পথের সঙ্গী হওয়ার জন্য হায়াতুজ্জামানের স্ত্রী বিলকিস বেগম আবদার ধরেছিল। ইচ্ছে করলে হায়াতুজ্জামান তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতেন। মুম্বাই যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার জন্য মাত্র বিশ হাজার টাকা জমা দিতে হয়েছে। বাকি খরচ সামাল দেবে আয়োজক কর্তৃপক্ষ। অবশ্য টাকা বেশি লাগলেও সেটা কোনো সমস্যা ছিল না। সমস্যা অন্য জায়গায়। হায়াতুজ্জামান মনে করেন, লারে-লাপ্পা বয়সটা পার করার পর স্বামী-স্ত্রীর আর একসঙ্গে ভ্রমণ করা ঠিক না। কাছে কিংবা দূরে, দেশে কিংবা বিদেশে; দূরত্ব যাই হোক না কেন— নতুন সঙ্গী জোগাড়ের ধান্ধা করা উচিত।

একজনের নামে দাওয়াতপত্রের কাগজ দেখিয়ে হায়াতুজ্জামান বিলকিস বেগমকে নিরস্ত করেছেন। ঘটনা বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা দেখে ঢাকা শহরের লোডশেডিংয়ের কথা মনে পড়ছে হায়তুজ্জামানের। লোডলেডিং মানেই হল— একদিকে আলো আর অন্যদিকে অন্ধকার। বিলকিস বেগমের এলাকা এখন অন্ধকার; বাতি জ্বলছে অন্য এলাকায়। এটি হচ্ছে তারাবানুর এলাকা।

রাতে জার্নি করতে হবে ভেবে রেস্ট পিরিয়ডে ঘুমানোর চেষ্টা করছিলেন হায়াতুজ্জামান। কলকাতার সর্বভারতীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্সের যেখানে খেলোয়াড়রা এসে থাকে, তার দুটি কক্ষে মহিলারা ও দুটি কক্ষে পুরুষরা ওঠেছে। দোতলা সিস্টেমে খাট বিছানো। হায়াতুজ্জামান উপরে ওঠে একটা খাটে শোয়ার পর মশার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নিচে নেমে এসে দেখেন, তারাবানু এরই মধ্যে কয়েকজন সখি জোগাড় করে ফেলেছে; তাদের সঙ্গে সে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। হৃদয়ে চোট লাগলেও তা গোপন করে তারাবানুর উদ্দেশে হায়াতুজ্জামান বললেন—

: কলকাতার মশা তো দেখতেছি ঢাকার মশার চাইতেও ভয়ংকর! এরা কাপড়ের নিচে ঢুকে কামড় বসায়!

হায়াতুজ্জামানের কথায় তারাবানুর মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সখিদের সঙ্গে সে বাইরে চলে গেল।

৩

রাত এগারোটায় মুম্বাই যাওয়ার ট্রেন। জনশ্বেরী এক্সপ্রেস। হায়াতুজ্জামান হাওড়া স্টেশনের পাশে তারাবানুকে নিয়ে মাটির ভাড়ে চা পান করছিলেন। চা পান শেষে হায়াতুজ্জামানকে মাটির ভাড় ব্যাগে ভরতে দেখে তারাবানু বলল—

: এইটা তো ওয়ানটাইম; চা খাওয়া শেষ হলে ফেলে দিতে হয়।

: আই নো ডিয়ার লেডি; আমি জানি। এইটা রাখলাম এন্টিক হিসেবে। আমার মৃত্যুর পর লোকজন এটা দেখে যাতে বুঝতে পারে— এই মাইট্যা ডিব্বায় একদিন হাওড়া স্টেশনের পাশে দাঁড়িয়ে আমি চা পান করেছিলাম...

ট্রেনে ওঠার পর দেখা গেল, আশিজনের রিজার্ভেশন ঠিক আছে; বাকি ছয়জনের নেই। হায়াতুজ্জামান সেই ছয়জনের দলে পড়ে গেলেন।

তারাবানু সান্ত্বনার সুরে বলল—

: কী আর করবেন! খাড়াইয়া খাড়াইয়া যান।

চোখ দুটো মার্বেলের মতো গোল করে হায়াতুজ্জামান বললেন—

: খাড়াইয়া খাড়াইয়া যাব মানে? এইটা কী ঢাকা টু টঙ্গি জার্নি— কাশতে কাশতে চলে যাব? হাওড়া থেকে মুম্বাই দুই হাজার একশ' কিলোমিটার পথ। পাক্কা দুই দিন, তিন রাতের ধাক্কা!

তারাবানু জানতে চায়—

: এখন তাইলে কী করবেন?

বিরসমুখে হায়াতুজ্জামান বললেন—

: কী আর করব! আপনি ঘুমান। আমি আপনার পাশে আছি।

ঘুমজড়ানো গলায় তারাবানু উত্তর দেয়—

: আমার কোনো নাইটগার্ডের প্রয়োজন নাই।

এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। হায়াতুজ্জামান টিমলিডারকে খোঁজার উসিলায় ওখান থেকে চলে এলেন। মুম্বাই পৌঁছার পর দেখা গেল, আন্দেরী রেলস্টেশনের কাছে একটা সওদাগরি অফিসের তিন ও চারতলার ফ্লোরে গণহারে তোশক বিছিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হায়াতুজ্জামান ভেবেছিলেন, তারকা চিহ্নিত না হোক; অন্তত একটা ভালো মানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। কোথায় ভালো মানের হোটেল আর কোথায় চিৎকাইত বোর্ডিং! পরদিন সকালবেলা অফিসের হলরুমে তারাবানুর সঙ্গে দেখা হল। কবিতা আগেই রচনা করে রেখেছিলেন হায়াতুজ্জামান। এবার অবমুক্ত করলেন—

চৌতলায় আমি
আর তেতলায় তুমি।
মাঝখানে কংক্রিটের দীর্ঘশ্বাস।
কেবলই দীর্ঘশ্বাস...

কবিতা শুনে হাসতে হাসতে তারাবানু বলল—

: বাহ! আপনে দেখতেছি কবিও!

: অবকোর্স কবি।

: আইজ আপনের প্রোগ্রাম কী?

: কোনো প্রোগ্রাম নাই।

: সেমিনারে যাবেন না?

: ধুর! এইসব আউলা-ফাউলা প্যাচাল ভাল্লাগে না।

: আমারও একই অবস্থা।

: তাইলে আর দেরি করার প্রয়োজন কী? চলেন, বের হয়ে পড়ি।

: আমি কিন্তু প্রত্যেক ফিল্মস্টারের বাড়ি যাব। গিয়ে বলব, মে তারাবানু; বাংলাদেশ থে আতা হ্যায়। মে আপকা বহুত বড়ি ফ্যান হ্যায়।

: অবশ্যই যাবেন। অবশ্যই বলবেন।

আদুরে গলায় তারাবানু বলল—

: কিন্তু কারও ঠিকানা যে জানা নাই!

: পকেটে টাকা থাকলে এইটা কোনো সমস্যাই না। আমরা দিনচুক্তিতে ট্যাক্সি ভাড়া করব। এখানকার ট্যাক্সি ড্রাইভাররা নিশ্চয়ই সব ফিল্মস্টারদের বাড়ির ঠিকানা জানে।

: ফাঁকে ফাঁকে আমি কিন্তু শপিংও করব।

: কোনো সমস্যা নাই।

৪

অনুসন্ধান করে জানা গেল, অধিকাংশ ফিল্মস্টারের বাড়ি জুহু বিচ এলাকায়। সাগরপাড়ের কথা শুনে হায়াতুজ্জামান তারাবানুকে নিয়ে সাগরজলে হামটিডামটি করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেললেন। সাগরে নামতে হলে সুইমিং কস্টিউম দরকার। এই বস্তু তার কাছে নেই; দোকান থেকে কিনতে হবে। তারাবানু সঙ্গে থাকা অবস্থায় এটা কেনা ঠিক হবে না। মতলব ফাঁস হয়ে গেলে তারাবানু পিছুটান দিতে পারে। পরে চুপিচুপি দোকান থেকে সাগর-অভিযানের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের অভিপ্রায়ে তারাবানুকে হায়াতুজ্জামান বললেন—

: জুহু বিচ এলাকায় আজ যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না।

অবাক হয়ে তারাবানু জানতে চাইল—

: কেন!

: ছুটির দিন ছাড়া কাউকে পারিবারিক পরিবেশে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

তুড়ি বাজিয়ে তারাবানু বলল—

: আজ তো শুক্রবার; ছুটির দিন।

তারাবানুর কথা শুনে হায়াতুজ্জামান টেনে টেনে বললেন—

: মাই ডিয়ার লেডি, ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন— আমাদের মতো এদের ছুটি শুক্রবারে না; এদের সাপ্তাহিক ছুটি হচ্ছে রবিবার।

আঙুলের কড় গুনে তারাবানু বলল—

: তার মানে পরশু। এই দুদিন তাহলে কী করব?

: আইজ আমরা ইন্ডিয়া গেট দেখতে যেতে পারি। আগামীকাল যাব অন্য কোনো এলাকায়...

ইন্ডিয়া গেটের পাশেই সাগর। সাগরের ওপাশে দুবাই— এটা শোনার পর তারাবানু আফসোস করতে লাগল—

: আহারে! এত কাছে দুবাই; যদি একটা ঘুরনা দিয়া আসতে পারতাম! ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে তারাবানুকে নিয়ে দুবাই পাড়ি জমানো সম্ভব, চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলে হায়াতুজ্জামান বললেন—

: এইটা কোনো ব্যাপারই না। ওই যে মাছধরার ট্রলার দেখা যাচ্ছে; ট্রলারের লোকজনের সঙ্গে গোপনে বন্দোবস্ত করতে পারলেই কেল্লাফতে। তবে...

: তবে কী?

: ধরা পড়লে কারবার শেষ।

আঁতকে ওঠার ভান করে তারাবানু বলল—
: তাইলে বাবা দরকার নাই।
ইন্ডিয়া গেট থেকে সামান্য দূরে বিখ্যাত তাজ হোটেল। তাজ হোটেলের লবিতে বসে ছবি তোলার জন্য বিভিন্ন ভঙ্গিতে পোজ দিল তারাবানু। ছবি তোলা শেষে তারাবানুর হাতে তার ক্যামেরা ফেরত দেয়ার সময় হায়াতুজ্জামান বললেন—
: ক্যামেরাম্যান হিসেবে যে ডিউটি করলাম, তার পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে না?
হায়াতুজ্জামানের আবদার শুনে ঠোঁট উল্টে তারাবানু বলল—
: কেমন ছবি ওঠাইছেন, কে জানে!
: ছবি খারাপ হইলে পয়সা রিটার্ন।
: ঠিক আছে; এখন বলেন, কী চান?
তারাবানু যদি ভেবে থাকে, হায়তুজ্জামান তার কাছে বাদাম খেতে চাইবেন; সেটা ভুল। মারাত্মক ভুল। তারাবানুর কাছে হায়াতুজ্জামানের অনেক কিছু চাওয়ার আছে। তবে হুটহাট কিছু চাওয়া ঠিক হবে না। হিতে বিপরীত হতে পারে। চাওয়ার আগে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি হলে হয়তো মুখে কিছু বলারই প্রয়োজন পড়বে না; চোখের দিকে তাকিয়েই তারাবানু বুঝে নেবে— সময় তার কাছে কী ডিমান্ড করছে। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কথা ভাবতে ভাবতে হায়াতুজ্জামান মনে মনে একটা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেললেন। সে মোতাবেক তারাবানুর কাছে জানতে চাইলেন—
: এখন তাইলে কী করবেন?
তারাবানু হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বলল—
: এইখানে আর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করি; তারপর খাঁচার পাখি খাঁচায় ফিইরা যাব।
: দুপুরে খাবেন কোথায়?
: কেন! যেখানে আমরা থাকি; সেই হোটেলে।
: ওইটারে আপনে হোটেল বলতেছেন! ওইটা তো একটা গুদাম।
: যাই হোক; ওইখানে যেহেতু খাবারের বন্দোবস্ত আছে, অন্য জায়গায় খাওয়ার দরকার কী?
: চলেন, আইজ আমি আপনেরে লাঞ্চ করাব।
: হঠাৎ!
: হঠাৎ না; বিষয়টা আমার মাথায় আগে থেইকাই ছিল। মুম্বাই যেহেতু আসছি— এইখান থেইকা সব ধরনের অভিজ্ঞতা লইয়া তবেই দেশে ফিরব। আমি ঠিক করছি, আইজ সন্ধ্যায় একটা ডিসকো বারে ঢুকব। সিনেমায় ইন্ডিয়ান নায়ক-নায়িকা ও তাদের ইয়ার দোস্তরা মদ খাইয়া যেসব কায়-কারবার করে; সেইগুলা প্র্যাকটিক্যালি আমিও করব।
: ও আল্লাহ! আপনে মদ খাবেন?
: সমস্যা কী? যে দেশের যে আচার। আপনে খেয়াল করছেন কিনা জানি না; আমাদের ওইখানে রাস্তার দুইপাশে একটু পরে পরে যেমন পান-বিড়ির দোকান; এদের এখানে হইল মদের দোকান। বিকেলবেলা অফিস ছুটির পর খেয়াল কইরা দেখবেন— কী সিন তৈরি হয়! মোটরসাইকেলের পেছনে ডার্লিংরে বসাইয়া ছেলেরা মদের দোকানে আইসা ব্রেক মারতেছে আর বোতল দুইটা কিইন্যা ব্যাগের মধ্যে ঢুকাইয়া ভো-ভো কইরা চইলা যাইতেছে। নো হেসিটেসন, নো ডাইনে-বামে চাওয়াচাওয়ি। আমি ঠিক কইরা রাখছি...
: কী ঠিক কইরা রাখছেন?
: শুধু মদই টেস্ট করব না। যদি কোনো বান্ধবী জুটাইতে পারি, ভালো; না পারলে বারের কোনো সুন্দরী নর্তকীরে লইয়াই উলা-লা-লা ড্যান্স দিব।
হায়াতুজ্জামানের কথা শুনে তারাবানু হাসতে হাসতে পেট ধরে বসে পড়ল। হাসি থামানোর চেষ্টা করতে করতে কোনোমতে বলল—
: কী ড্যান্স বললেন! উলা-লা-লা?
: হ।
: এইখানে একটু নাইচ্যা আমারে দেখান তো।
: আরে ধুর! রাইতের নাচ দিনে নাচলে পাবলিক কী বলবে! আপনের যদি নাচ দেখার শখ থাকে, তাইলে আইজ সন্ধ্যার পরে চলেন কোনো একটা ডিসকো বারে ঢুইক্যা পড়ি। খরচের চিন্তা করবেন না। খরচাপাতি যা হবে, সব আমার কান্ধে চাপাইয়া দিবেন; নো প্রোবলেম।
তারাবানু কোনো মতামত দিল না; বরং গম্ভীর হয়ে গেল। হায়তুজ্জামান মনে মনে হাসলেন। আজকের পরিকল্পনায় নাচানাচির বিষয়টা নেই; শুধু হাত ধরাধরির মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। নাচানাচি-ঢলাঢলির কথা হায়াতুজ্জামান বলেছেন, তারাবানুকে একটু বাজিয়ে দেখার জন্য। পরিকল্পনায় যেটা আছে, তা হল— দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর হায়াতুজ্জামান তারাবানুকে ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে মারাঠা মন্দিরে ঢুকবেন। তারপর সেখানকার আধো আলো, আধো অন্ধকার পরিবেশে হাত ধরাধরির কাজটা সেরে ফেলবেন। দ্বিতীয় দিন ধরবেন কোমর। এরপর তৃতীয় দিন জহু বিচ এলাকায় যাওয়ার পর সাগর জলে; এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ...

৫
পরিকল্পনা অনুযায়ী মারাঠা মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকের একটা রেস্টুরেন্টে তারাবানুকে নিয়ে খেতে বসলেন হায়াতুজ্জামান। খাওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে তারাবানুর কাছে হায়াতুজ্জামান জানতে চাইলেন—
: খাওয়ার পরে গন্তব্য কোথায়; ঠিক করছেন?
: আন্দেরী ফিইরা যাব। রেস্ট নিতে হবে। একটানা ট্রেনজার্নির পরে শরীরটা কেমন জানি ঝিমঝিম করতেছে।
তারাবানুর কথা শুনে হায়াতুজ্জামান আঁতকে ওঠার ভান করলেন। বললেন—
: গুদামে তো এসি নাই। এই গরমের মধ্যে ওইখানে গেলে আপনের চান্দি গোল হয়ে যাবে। আমি ঠিক করছি, খাওয়ার পরে ওই যে মারাঠা মন্দির দেখতেছেন— ওইখানে ঢুকব। এসির মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া তারপর ফিরব। ততক্ষণে সূর্য অস্ত যাবে; গরমও কিছুটা কমবে।
: মন্দিরে যাবেন কী করতে?
: সিনেমা দেখতে।
হায়াতুজ্জামানের কথায় মুখে খাবার তুলতে ভুলে গেল তারাবানু। অবাক হয়ে বলল—
: মন্দিরে যাবেন সিনেমা দেখতে! আপনের মাথা কি ঠিক আছে?
হায়াতুজ্জামান মুচকি হেসে তার প্রিয় সংলাপের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বললেন—
: মাই ফেয়ার লেডি, নামে মন্দির হইলেও এইটা একটা সিনেমা হল। আর দশটা সিনেমা হলে যে নিয়মে সিনেমা প্রদর্শিত হয়; এইখানেও ঠিক সেইটাই হয়।
: মন্দিরে সিনেমা হল!
: অবাক হইলেন, না? বাংলাদেশেও কিন্তু একটা সিনেমা হলের সঙ্গে মন্দির নামটা যুক্ত আছে। বলতে পারবেন, সেটা কোথায়?
কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল তারাবানু। বলল—
: নাহ! পারলাম না।
: ময়মনসিংহ শহরে ছায়াবাণী নামে একটা সিনেমা হল আছে। ওইটার আদি নাম হচ্ছে অমরাবতী নাট্যমন্দির। ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন— আগের দিনে জমিদাররা তাদের বাড়ির আঙিনায় দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটা নাটমন্দির বা নাট্যমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করতেন; যেখানে পূজা বা অন্য কোনো উৎসব উপলক্ষে নাটক বা যাত্রাপালার আয়োজন করা হইত। কাজেই মন্দির বলতে কেবল ধর্মীয় উপাসনালয় ভাবলে ভুল করবেন। কালচারাল বিষয়টাও এর সঙ্গে যুক্ত। মারাঠা মন্দিরে ওইসময় শাহরুখ খান-কাজল অভিনীত যে সিনেমা প্রদর্শিত হচ্ছিল; সেটি তারাবানুর কমন পড়ে গেল। তারাবানু বলল—
: এই সিনেমা অসংখ্যবার দেখছি। পয়সা খরচ কইরা পুনরায় দেখার প্রয়োজন আছে?
পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে দেখে প্রমাদ গুনলেন হায়াতুজ্জামান। তারাবানুকে নিয়ে সিনেমা হলে ঢুকতে না পারলে গোড়ায় গলদ থেকে যাবে। গোড়ায় গলদ রেখে বাদবাকি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে একটা ছেড়াবেড়া অবস্থা তৈরি হতে পারে। হায়তুজ্জামান এমনভাবে তাকালেন— যেন তারাবানুর কথা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়েছেন। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তারাবানুর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন—
: দেখছেন তো একটা চোঙ্গার মধ্যে! টেলিভিশনের পর্দায় সিনেমা দেখা আর হলে বইসা দেখা কি এক হইল? তাছাড়া মুম্বাই আসছেন— আপনের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যদি সিনেমা হলে বইসা সিনেমা দেখার ঘটনা না থাকে; তাইলে দেশে ফিইরা মুখ দেখাবেন কেমনে?

তারাবানু শেষ পর্যন্ত রাজি হল। হায়াতুজ্জামান টিকিট কাটতে গিয়ে দেখলেন— কাউন্টারের কাছে ভেড়া দুঃসাধ্য। এক কালোবাজারির কাছ থেকে দ্বিগুণ দামে দুটো টিকিট কেটে তারাবানুকে নিয়ে হলে ঢুকলেন হায়াতুজ্জামান। শরীর-মনে একধরনের ভালো লাগা অনুভূতি কাজ করতে শুরু করেছে। হায়াতুজ্জামান তারাবানুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারাবানু তাকে নিরাশ করল না; চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ-তরঙ্গ তুলে হায়াতুজ্জামানের হাত ধরল। খুশিতে হায়াতুজ্জামান লাফ দিতে যাচ্ছিলেন। পরে মনে হল, এসময় এটা করা ঠিক হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। বল কোর্টে ঢুকে গেছে। এসময় ধৈর্যহারা হলে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। টর্চলাইট হাতে একজন সাহায্যকারী এগিয়ে এলেন। হায়াতুজ্জামান টিকিট দুটো তার হাতে তুলে দেয়ার পর তিনি দুই মুল্লুকে দুজনকে বসার নির্দেশ দিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। অবস্থা দেখে হায়াতুজ্জামানের মাথায় হাত। তীরে এসে তরী ডুবতে বসেছে, এটা হৃদয়ঙ্গম করার পর হায়াতুজ্জামান শেষ চেষ্টা চালালেন। সিটে বসে থাকা এক ভদ্রলোকের দরবারে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে সমস্যা পেশ করার পর সমাধান চাইলে ভদ্রলোক তার পাশে বসে থাকা সঙ্গিনীর দিকে ইঙ্গিত করে হিন্দিতে যা বললেন, তার মর্মার্থ হচ্ছে এরকম—

: তুমি তোমার জুটি ঠিক রাখার জন্য আমাকে এখান থেকে অন্য জায়গায় যেতে বলছ; কিন্তু এটা করলে আমাদের জুটি যে ভেঙ্গে যাবে; তা কি ভেবে দেখেছ!

হায়াতুজ্জামান স্যরি বলে কয়েক সারি পেছনে গিয়ে তার নির্ধারিত আসনে বসলেন। হাঃ ! একেই বলে ফাটা কপাল। চিত্রনাট্যের শুরুটা ভালোই হয়েছিল— হাতে হাত পড়েছিল। এরপরই তাকে একটা ফালতু পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হল! দিনের শুরু দেখে সারাটা দিন কেমন যাবে, তা বলা যায়— এই আপ্তবাক্য রচয়িতার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে হায়াতুজ্জামান উচ্চারণ করলেন—

: নিয়তি বইলা একটা কথা আছে; তার সামনে তোমার বাণী-ফানি সব অচল।

ইন্টারভেলের সময় হায়াতুজ্জামান তারাবানুর কাছে গেলেন। জানতে চাইলেন, সে কিছু খাবে কিনা? তারাবানু পপকর্ণ আর কোকের ফরমায়েশ দিল। এ বস্তু দুটো তারাবানুর হাতে তুলে দিয়ে হায়াতুজ্জামান তার জায়গায় ফিরে গেলেন। সিনেমা দেখায় এখন আর মন নেই হায়াতুজ্জামানের। সিনেমা হলকে জেলখানা মনে হচ্ছে। কখন এ কারাগার থেকে মুক্তি মিলবে— এ প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকলেন হায়াতুজ্জামান।

ফেরার পথে ফুটপাতে আঙ্গুর কিনতে গিয়ে অবাক হলেন হায়াতুজ্জামান। গলায় বিস্ময়ের ঢেউ তুলে তারাবানুকে বললেন—

: মাত্র পঁচিশ রুপিতে এক কেজি আঙ্গুর! ইস! আঙ্গুরটা যদি বাংলাদেশে চাষ হইত; তাহলে পাবলিক পঞ্চাশ টাকা কেজির চাল না খেয়ে আঙ্গুর খেয়েই দিন কাটাতে পারত!

তারাবানু সঙ্গে সঙ্গে বলল—

: আমাদের আঙ্গুর নাই; কিন্তু পাতাকপি আছে। বিশ টাকা দামের একটা পাতাকপির ওজন চার-পাঁচ কেজি। তার মানে কেজি পড়ল চার বা পাঁচ টাকা। প্রয়াত এক অর্থমন্ত্রী এইটা ভেবেই জাতিকে পাতাকপি খাওয়ার পরামর্শ দিছিলেন।

: মানলাম। কিন্তু পাবলিক যে চালের পরিবর্তে পাতাকপি খাবে— এই জিনিস তো সারা বছর পাওয়া যায় না।

: চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না কেন? এখন সারাবছর টমেটো চাষ হচ্ছে না?

৬

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে হায়াতুজ্জামান নিজেকে তৈরি করে ফেললেন। নিচে নেমে তারাবানুর খোঁজ করতেই একজন জানাল, সে গোসলে ঢুকেছে। নাশতার টেবিলে তারাবানুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে কোমর ব্যথা হওয়ার উপক্রম। অগত্যা তারাবানুর সঙ্গে নাশতা করার আশা পরিত্যাগ করে হায়াতুজ্জামান রুটিতে কামড় বসালেন। তারাবানু এলো আরও অনেকক্ষণ পর। হায়াতুজ্জামানকে দেখে বলল—

: আপনি এইখানে? আমি আরও উপরে যাইয়া খোঁজাখুঁজি কইরা আসলাম। শুনেন, একটা দারুণ সুযোগ পাওয়া গেছে। মহিলারা কয়েকজন মিলে একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করছে। সঙ্গে তাদের ইয়েরা থাকবে। আমি আপনের কথা বলছি।

হায়াতুজ্জামানের মন ভেঙ্গে গেল। তার অভিলাষ ছিল— তারাবানুর সঙ্গে একলা ঘোরাঘুরির। ঘুরতে ঘুরতে হাত ধরাধরির পরের স্টেজে পৌঁছার। কিন্তু গ্রুপস্টাডিতে গেলে সেই সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে! মুখে রুটি পুরতে পুরতে তারাবানু জানাল—

: সিদ্ধান্ত হইছে, আইজ সবাই এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড, ফিল্ম সিটি আর হাজি আলীর মাজার দেখতে যাবে। আগামীকাইল অন্য প্রোগ্রাম।

কিচিরমিচির কোম্পানিতে যোগ দিতে মন সায় দিচ্ছে না হায়াতুজ্জামানের। সময় ও অর্থ— দুটোরই অপচয়। হায়াতুজ্জামান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। চেহারায় সিরিয়ায় ভাব আমদানি করে বললেন—

: আইজ তো আমি যাইতে পারব না।

: কেন!

: সেমিনারে আইজ আমার প্রতিষ্ঠানের পেপার উপস্থাপন আছে।

চোখ কপালে তুলে তারাবানু বলল—

: এই কথা তো আগে বলেন নাই!

: মনে ছিল না। ফেরার পর ডাইরি দেইখা মনে পড়ছে।

নাশতা শেষ করে তারাবানু অন্যদের সঙ্গে মাইক্রোবাসে উঠল। হায়াতুজ্জামান মনে মনে আশা করছিলেন— তার অভিমানের ঢেউ তারাবানুর হৃদয়কুঞ্জে আছড়ে পড়ার পর সঙ্গী হওয়ার জন্য হায়াতুজ্জামানকে সে পীড়াপীড়ি করবে। আফসোস! সেসব কিছুই ঘটল না। ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের সম্মেলনে আটদিনে বত্রিশটা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এসব অধিবেশনে যোগ দেয়ার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হায়াতুজ্জামান অধিবেশনে গেলেন না। আন্দেরী রেলস্টেশনের ফুটওভার ব্রিজে দাঁড়িয়ে ট্রেনের আসা-যাওয়া দেখতে লাগলেন।

পরদিন উপযাচক হয়ে দলে যোগ দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন হায়াতুজ্জামান। তারাবানু জিহ্বা দিয়ে চু-চু শব্দ করে আদ্র গলায় বলল—

: আহা রে!

বিস্মিত হয়ে হায়াতুজ্জান বললেন—

: আহা রে কেন?

: গাড়িতে তো আর সিট নাই। আপনের শূন্যস্থান পূরণ হইয়া গেছে। দলে নতুন একজনরে নেওয়া হইছে।

৭

ফেরার পথে দল কলকাতায় একদিনের যাত্রাবিরতি করল। এই একদিন তারাবানুকে নিয়ে নিউমার্কেট, কলেজ স্ট্রিট, মেট্রো সিনেমা আর গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন হায়াতুজ্জামান। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারাবানুর ডেরায় গিয়ে খোঁজ করতেই এক মহিলা বললেন—

: দিদি তো নাই।

: কোথায় গেছে।

: হোটেলে উঠেছে।

: বুঝলাম না! দল ছাইড়া হোটেলে উঠছেন কেন?

: দিদির হাজবেন্ড ওনার অসুস্থ মাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছেন। তারা যে হোটেলে উঠেছেন, চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিদিও সেখানে থাকবেন। তারপর সবাই একসঙ্গে ফিরবেন।

: অ।

বাংলাদেশ অভিমুখে বাস ছাড়ার পর হায়াতুজ্জামান মনে মনে বললেন—

: বিদায় ইন্ডিয়া, বিদায় কলকাতা; বিদায় তা...

তারাবানুর নাম নিতে গিয়ে হায়াতুজ্জামানের মনে হল, গলায় কিছু একটা আটকে গেছে। পাশের সিটে বসা বয়স্ক ভদ্রলোক খুকখুক করে কেশে হায়াতুজ্জামানের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন—

: অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, চুপচাপ বসে আছেন; কোনো কারণে কি আপনার মন খারাপ?

মন খারাপ মানে? অত্যধিক খারাপ। মন খারাপের বিষয়-বৃত্তান্ত বুড়া মিয়াকে বলা যাবে না। সহযাত্রীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হায়াতুজ্জামান ঠোঁটের কোণায় এমন একখণ্ড হাসির সমাবেশ ঘটালেন; যার পরতে পরতে বেদনারা লুকিয়ে ছিল।